بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ০৯ তাবুক, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র জীবনের কিছু ঘটনা (আজ) বর্ণনা করব। হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে ডাকেন এবং বলেন, আমাকে উমর সম্পর্কে বলো। তখন তিনি অর্থাৎ, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা! খোদার কসম, তিনি অর্থাৎ হযরত উমর আপনার ধারণার চেয়েও উত্তম (ব্যক্তি), শুধুমাত্র এটি ব্যতিরেকে যে, তার প্রকৃতিতে কঠোরতা রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কঠোরতার কারণ হলো; তিনি আমার মাঝে নম্রতা প্রত্যক্ষ করেন। যদি এমারত তার স্কন্ধে অর্পিত হয় তাহলে তিনি নিজের অনেক বিষয় পরিত্যাগ করবেন যা তার মাঝে রয়েছে। কেননা আমি দেখেছি যে, আমি যখন কারো প্রতি কঠোরতা করি তখন তিনি আমাকে সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। আর আমি যখন কারো প্রতি নম্রতাপূর্ণ আচরণ করি তখন তিনি আমাকে তার প্রতি কঠোর হতে বলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে ডাকেন এবং তার কাছে হযরত উমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, তার ভেতরটা তার বাইরের চেয়েও উত্তম আর আমাদের মাঝে তার মতো কেউ নেই। তখন হযরত আবু বকর (রা.) উভয় সাহাবীকে বলেন, আমি তোমাদের দু'জনকে যা কিছু বলেছি তা অন্য কারো কাছে উল্লেখ করবে না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি যদি হযরত উমরকে বাদ দেই তাহলে আমি উসমানের চেয়ে সামনে যাই না। আর তার এই অধিকার থাকবে যে, তিনি যেন তোমাদের বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি না করেন। এখন আমার বাসনা হলো, আমি তোমাদের বিষয়াদি থেকে পৃথক হয়ে যাব আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। হযরত আবু বকর (রা.)'র অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি হযরত উমরকে মানুষের জন্য খলীফা মনোনীত করেছেন! অথচ আপনি দেখছেন যে, তিনি আপনার জীবদ্দশাতেই মানুষের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেন। আর তখন কী অবস্থা হবে যখন তিনি একা থাকবেন আর আপনি আপনার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তিনি আপনাকে প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিজ প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমাকে বসাও। তিনি শুয়ে ছিলেন, তিনি বলেন, আমাকে বসিয়ে দাও। বসার পর, অর্থাৎ তাকে ধরে বসানোর পর তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাচ্ছ? আমি যখন আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করব আর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন তখন আমি উত্তর দিব যে, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমার বান্দাদের ওপর খলীফা মনোনীত করেছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থাবলীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, আমি কাকে খলীফা মনোনীত করব? অধিকাংশ সাহাবী হযরত উমর (রা.)'র এমারতের পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করেন। আর কেউ কেউ শুধু এতটুকু আপত্তি করেন যে, হযরত উমর (রা.)'র প্রকৃতিতে অধিক কঠোরতা বিদ্যমান। এমন যেন না হয় যে, তিনি মানুষের প্রতি কঠোরতা করবেন। তিনি বলেন, এই কঠোরতা ততক্ষণ পর্যন্ত ছিল যতক্ষণ তার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। এখন যখনকিনা একটি গুরুদায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হবে তখন তার কঠোরতার উপাদানও মধ্যমপন্থার গণ্ডিভুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, সকল সাহাবী হযরত উমর (রা.)'র খিলাফত লাভের বিষয়ে সম্মত হন। তাঁর অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.)'র স্বাস্থ্য যেহেতু অনেকটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর স্ত্রী আসমা'র সাহায্য নেন আর এরূপ অবস্থায়, যখনকিনা তার পা দোদুল্যমান ছিল ও হাত কম্পমান ছিল, তিনি মসজিদে আসেন এবং সকল মুসলমানের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন, আমি অনেক দিন যাবৎ অনবরত এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি যে, আমি যদি মৃত্যু বরণ করি তাহলে তোমাদের খলীফা কে হবে? অবশেষে অনেক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা এবং দোয়া করার পর আমি এটিই সমীচীন মনে করেছি যে, খলীফা হিসেবে আমি উমরকে নিযুক্ত করবো। তাই আমার মৃত্যুর পর উমর তোমাদের খলীফা হবেন। সমস্ত সাহাবী এবং অন্য লোকেরা এই এমারত বা নিযুক্তিকে মেনে নেন আর হযরত আবু বকর (রা.)'র তিরোধানের পর হযরত উমর (রা.)'র হাতে বয়'আত করেন।

এরপর এ সম্পর্কে অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, কেন মনোনীত করা হলো;

তিনি (রা.) বলেন, যদি বলা হয় যে, জাতির নির্বাচনেই যদি কেউ খলীফা হতে পারে তাহলে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে কেন মনোনীত করেছিলেন? তাহলে এর উত্তর হলো এই যে, তিনি এমনিতেই মনোনীত করেন নি, বরং প্রথমে সাহাবীদের কাছ থেকে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা একটি প্রমাণিত বিষয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, খলীফাদের মৃত্যুর পর অন্য খলীফাদের নির্বাচিত করা হয়েছে আর হযরত উমরকে হযরত আবু বকর (রা.)'র জীবদ্দশাতেই নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) এখানেই ক্ষান্ত হন নি আর এটিকেই যথেষ্ট মনে করেন নি যে, কতিপয় সাহাবীর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের পরই তিনি হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, বরং চরম দুর্বলতা এবং অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্ত্রী'র সাহায্য নিয়ে মসজিদে আসেন এবং মানুষকে বলেন যে, হে লোক সকল! সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের পর আমি আমার পর খিলাফতের জন্য উমরকে পছন্দ করেছি। তোমরাও কি তার খিলাফতের বিষয়ে সম্মত আছ? তখন সবাই তাদের সম্মতি প্রকাশ করেন। অতএব, এটিও একদিক থেকে নির্বাচনই ছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র অসুস্থতা এবং ওসীয়্যত সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে। তাবারীর ইতিহাসে হযরত আবু বকর (রা.)'র অসুস্থতা ও তিরোধানের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র অসুস্থতার কারণ ছিল এই যে, ৭ জমাদিউল আখের রোজ সোমবার তিনি গোসল করেন। সেদিন খুব শীত ছিল। এ কারণে তার জ্বর হয়, যা ১৫দিন পর্যন্ত থাকে। এমনকি তিনি নামাযের জন্য বাহিরে আসতেও অসমর্থ

হয়ে পড়েন। তিনি নির্দেশ দেন, হযরত উমর যেন নামায পড়াতে থাকেন। মানুষ তাঁর শুশ্রূষার জন্য আসতো। কিন্তু দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। সে যুগে হযরত আবু বকর (রা.) সেই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন যা মহানবী (সা.) তাঁকে দান করেছিলেন এবং যেটি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র বাড়ির সামনে অবস্থিত ছিল। অসুস্থতার দিনগুলোতে অধিকাংশ সময় হযরত উসমান (রা.) তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। তিনি ১৫দিন পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। কেউ তাঁকে বলে, আপনি ডাক্তার ডেকে নিলে ভালো হবে। তিনি বলেন, তিনি আমাকে দেখেছেন। মানুষ জিজ্ঞেস করে, তিনি আপনাকে কী বলেছেন? তিনি বলেন, তিনি বলেছেন, **ইন্নী আফআলু মা আশাউ**। অর্থাৎ, আমি যা চাই তা-ই করি। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন অসুস্থ হন তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করে, আমরা কি আপনার জন্য ডাক্তার ডাকব? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তিনি আমাকে দেখেছেন এবং বলেছেন, **ইন্নী ফাআলু লেমা উরীদ**। অর্থাৎ, আমি যা চাইব তা অবশ্যই করব। যাহোক, তাঁর এ কথার অর্থ ছিল, এখন আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এটিই যে, তিনি আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিবেন আর কোন ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। হযরত আবু বকর (রা.) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ২২শে জমাদিউল আখের, ১৩ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তার খিলাফতকাল ছিল দুই বছর তিন মাস দশ দিন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র ওষ্ঠ থেকে সর্বশেষ যে শব্দাবলী উচ্চারিত হয়েছিল তা ছিল পবিত্র কুরআনের এই আয়াত, تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (সূরা ইউসুফ: ১০২)। অর্থাৎ, আমাকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও আর আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র আংটিতে খোদাই করা ছিল نِعْمَ الْقَادِرُ اللهُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা কতই না কুদরত বা ক্ষমতার অধিকারী।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার কাফন ও দাফন শেষে দেখবে যে, আর কোনো জিনিস রয়ে যায়নি তো। বাকি সব তো তিনি হযরত উমরকে দিয়ে দিয়েছিলেন, কোনো কিছু বাকি রয়ে যায়নি তো। যদি থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সেটিও হযরত উমরের কাছে পাঠিয়ে দিবে। কাফন ও দাফন সম্পর্কে বলেন, এখন আমার দেহে যে কাপড় আছে সেটিকেই ধুয়ে অন্যান্য কাপড়ের সাথে কাফন দিবে। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, এটি তো পুরোনো, কাফনের জন্য নতুন কাপড় হওয়া উচিত। তিনি বলেন, জীবিতরা মৃতদের তুলনায় নতুন কাপড় পাওয়ার বেশি অধিকার রাখে। নতুন কাপড়টি কোনো জীবিতকে পরিধান করালে তা অধিক উত্তম হবে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস যেন তাকে গোসল করান। হযরত আবু বকর (রা.)'র পুত্র হযরত আব্দুর রহমান তার সাথে সাহায্য করেন। দু'টি কাপড় দিয়ে তাঁর কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মাঝে একটি কাপড় গোসলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছিল। এরপর তাঁকে মহানবী (সা.)-এর খাটিয়ার ওপর রাখা হয়। এটি সেই খাট ছিল যাতে হযরত আয়েশা (রা.) শয়ন করতেন। এই খাটে করেই তাঁর জানাযা বহন করা হয়। হযরত উমর মহানবী (সা.)-এর সমাধি এবং মিম্বরের মাঝখানে তাঁর জানাযা পড়ান আর রাতের বেলা এই হুজরা বা ঘরেই মহানবী (সা.)-এর সমাধির সাথে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মাথা মহানবী (সা.)-এর কাঁধ বরাবর রাখা হয়। দাফনের সময় হযরত উমর বিন খাত্তাব, হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত তালহা

বিন উবায়দুল্লাহ্ আর হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) কবরে নামেন আর দাফনকার্য সম্পন্ন করেন। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর হযরত আবু বকর (রা.)-কে রাতের বেলা দাফন করেন। হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ তার পিতার এই ভাষ্য বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র মৃত্যুর কারণ ছিল মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর বিয়োগ বেদনা, কেননা মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তাঁর শরীর ক্রমাগতভাবে দুর্বল হতে থাকে। অবশেষে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। কোন কোন জীবনীকারক এটিও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল সেই খাবার যাতে কোন ইহুদি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে জীবনীকারগণ এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, আজ কি বার? লোকেরা বলে, সোমবার। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আজ যদি আমি মৃত্যু বরণ করি তাহলে আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করবে না, কেননা আমার কাছে সেই দিন বা রাত অধিক প্রিয় যা মহানবী (সা.)-এর অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ, সেদিনই সমাহিত হয়ে গেলে তা অধিক উত্তম হবে। হযরত আবু বকর (রা.) নিজের রেখে যাওয়া সম্পত্তি সম্পর্কে বলেন, আমার (মৃত্যুর) পর কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যেন তা বণ্টন করে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে যারা উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়স্বজনদের জন্য পঞ্চমাংশের ওসীয়্যত করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)'র স্ত্রী এবং সন্তানদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর চারজন স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী ছিলেন **কুতায়লা বিনতে আব্দুল উয্যা**। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত আসমার মাতা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) অজ্ঞতার যুগে তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একবার মদিনায় হযরত আসমা'র কাছে কিছুটা ঘি, অর্থাৎ নিজের মেয়ের কাছে কিছু ঘি ও পনীর উপহার স্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হযরত আসমা (রা.) সেই উপহার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং তাকে বাড়িতেও প্রবেশ করতে দেন নি। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে সংবাদ পাঠান যে, (আমার করণীয় কি) এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করুন। হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন যে, জিজ্ঞেস করে বলুন, আমার মা এসেছে এবং উপহার নিয়ে এসেছে। আমি তাকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেই নি, (এ ব্যাপারে) নির্দেশ কী? তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দাও এবং তার উপহার গ্রহণ করো।

দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল হযরত উম্মে রূমান বিনতে আমের। তিনি বনু কিনানা বিন খুযায়মা গোত্রের সদস্যা ছিলেন। তার প্রাক্তন স্বামী হারেস বিন সাখবারা মক্কায় মৃত্যু বরণ করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়'আত করেন আর মদিনা অভিমুখে হিজরত করেন। তার গর্ভে হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে মদিনায় মৃত্যু বরণ করেন। মহানবী (সা.) স্বয়ং তার কবরে নামেন এবং তার ক্ষমালাভের জন্য দোয়া করেন।

তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হযরত আসমা বিনতে উমায়েস বিন মা'বাদ বিন হারেস। তার ডাকনাম ছিল উম্মে আব্দুল্লাহ্। তিনি মুসলমানদের দ্বারে আরকামে প্রবেশ করার পূর্বেই মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়'আতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক

হিজরতকারীনিদের একজন ছিলেন। তিনি তার স্বামী হযরত জা'ফর বিন আবু তালেব (রা.)'র সাথে প্রথমে ইথিওপিয়া অভিমুখে হিজরত করেন এবং সেখান থেকে সপ্তম হিজরীতে মদিনায় আসেন। অষ্টম হিজরীতে মূতা'র যুদ্ধে হযরত জা'ফর (রা.) শহীদ হয়ে গেলে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার গর্ভে মুহাম্মদ বিন আবী বকর জন্মগ্রহণ করেন।

চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা বিন যায়েদ বিন আবু যুহায়ের। তিনি আনসারদের শাখা খাযরাজ গোত্রের সদস্যা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মদিনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুনআ'তে তার সাথে বসবাস করতেন। তার গর্ভে হযরত আবু বকর (রা.)'র কন্যা উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার জন্ম হয়।

সন্তানদের মধ্যে চারজন পুত্র ও তিনজন কন্যা ছিলেন। প্রথম পুত্র হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি হুদায়বিয়ার দিন মুসলমান হন এবং এরপর ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে বিখ্যাত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল।

দ্বিতীয় (পুত্র) ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর। মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের সময় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি সারাদিন মক্কায় অতিবাহিত করতেন এবং মক্কাবাসীদের সংবাদ সংগ্রহ করে রাতের বেলা গোপনে গুহায় পৌঁছে সেসব সংবাদ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে শোনাতেন আর সকালবেলা মক্কায় ফিরে আসতেন। তায়েফের যুদ্ধে তার (দেহে) একটি তির বিদ্ধ হয় যার ক্ষত সারে নি আর অবশেষে এ কারণেই হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

তৃতীয় পুত্র ছিলেন মুহাম্মদ বিন আবু বকর। তিনি হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)'র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জের সময় যুল হুলায়ফায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.)'র ক্রোড়ে তিনি লালিতপালিত হন এবং হযরত আলী (রা.) স্বীয় খিলাফতকালে তাকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানেই নিহত হন। কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত উসমান (রা.)'র হন্তারকদের মধ্যে তার নামও উল্লেখ করা হয় আর এ কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল, (প্রকৃত সত্য) আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চতুর্থ হলেন, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর। তিনি **'যাতুন্ নিতাকায়েন'** নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)'র চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে **'যাতুন্ নিতাকায়েন'** উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, কেননা হিজরতের সময় তিনি মহানবী (সা.) এবং তার পিতার জন্য রসদপত্র প্রস্তুত করেন আর তা বাঁধার জন্য কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না বিধায় নিজের কোমরবন্ধনী ছিড়ে (তদ্বারা) পাথেয় বেঁধে দেন। (অর্থাৎ) খাবারের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা কোমরবন্ধনীর কাপড় দ্বারা বেঁধে দিয়েছিলেন। হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল এবং গর্ভাবস্থায় তিনি মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর তার গর্ভ থেকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের জন্মগ্রহণ করেন, যিনি হিজরতের পর জন্মগ্রহণকারী সর্বপ্রথম শিশু ছিলেন। হযরত আসমা একশ' বছর আয়ু লাভ করেন। তিনি ৭৩ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

পঞ্চম সন্তান ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)। তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেমা বা জ্ঞানী ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে **উম্মে আব্দুল্লাহ্** ডাকনাম দিয়েছিলেন। তার প্রতি মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় ভালোবাসা ছিল। ইমাম শা'বী বর্ণনা করেন, যখন মাসরুক হযরত আয়েশার বরাতে কোন রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, **"আমার কাছে সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক বর্ণনা করেছেন, যিনি আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদের প্রিয়তমা এবং যার নির্দোষ হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা (আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন।"** ৬৩ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। অপর এক বর্ণনানুযায়ী ৫৮ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর। তিনি হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা আনসারীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, এরা হলো তোমার দুই ভাই এবং দুই বোন। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, এ হলো আমার বোন আসমা– একে তো আমি চিনি, কিন্তু আমার দ্বিতীয় বোন কে? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যে খারেজার মেয়ের গর্ভে রয়েছে। অর্থাৎ, এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, অনাগত সন্তান কন্যা হবে। তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে একথা গেঁথে গিয়েছিল যে, তার ঘরে কন্যা সন্তান হবে। অতএব, এমনটিই হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর পর উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র সাথে, যিনি জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রীর যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)'র এক কন্যার বিয়ে হযরত বেলাল (রা.)'র সাথে হয়েছিল আর এটিও বর্ণিত হয় যে, এই কন্যা তার চার স্ত্রীর মধ্যে থেকে কোন একজন স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীর পক্ষ থেকে ছিল।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে, আবু বকর (রা.) যখন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হতেন বা তিনি কীভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। এক্ষেত্রে যেখানে পরামর্শের প্রয়োজন পড়ত বা পরামর্শকদের প্রয়োজন দেখা দিত অথবা ফিকাহ্‌বিদদের পরামর্শ গ্রহণ করতে চাইলে তিনি মুহাজের এবং আনসারদের মধ্য থেকে **হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত মু'আয বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)**-কেও ডাকতেন অথবা কোনো কোনো সময় অধিক সংখ্যক মুহাজের এবং আনসারদের একত্রিত করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) **شَاوِرْهُمْ** এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, এই শব্দের প্রতি অভিনিবেশ করো। এথেকে বুঝা যায়, পরামর্শগ্রহণকারী একজন- দু'জনও নন, আর যাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে তারা যেন অবশ্যই তিন বা তিনের অধিক হয়। এরপর তিনি এই পরামর্শের প্রতি অভিনিবেশ করবেন। এরপর নির্দেশ হলো, **فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** অর্থাৎ, কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করলে তা পূর্ণ করো আর (এক্ষেত্রে) কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না। অর্থাৎ, পরামর্শগ্রহণকারী পরামর্শগ্রহণের পর সব দিক যাচাই-বাছাই করে সে অনুসারে কাজ করবে আর এরপর কারো তোয়াক্কা করবে না। তিনি (রা.) লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে এই দৃঢ় সংকল্পের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মানুষ যখন মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হতে আরম্ভ করে তখন (তাঁকে) পরামর্শ দেয়া হয়, উসামার নেতৃত্বাধীন যাত্রার জন্য অপেক্ষমান এই সেনাদলকে আটকে দিন। কিন্তু তিনি (রা.) উত্তরে বলেন,

মহানবী (সা.) যে সেনাদল প্রেরণ করেছেন সেটিকে আমি আটকাতে পারব না। এমনটি করার মতো শক্তি আবু কোহাফার পুত্রের নেই। পরে (অবশ্য) কাউকে কাউকে রেখেও দিয়েছিলেন। যেমন– হযরত উমর (রা.)ও এই সেনাদলের সাথে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাকে তিনি রেখে দেন।

আবার যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হওয়া থেকে রক্ষা করতে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, তারা যদি মহানবী (সা.)-কে উট বাঁধার একটি রশিও দিত তাহলে আমি তা-ও নিব। আমাকে পরিত্যাগ করে তোমরা সবাই যদি চলে যাও এবং মুরতাদদের সাথে জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তুও যুক্ত হয়ে যায় তাহলে আমি একাই তাদের সবার সাথে যুদ্ধ করব। এটি হলো দৃঢ় সংকল্পের দৃষ্টান্ত আর এরপর কী হয়েছিল তা তোমরা জানো। এটি ছিল হযরত আবু বকর (রা.)'র দৃঢ় সংকল্প, অন্যান্য মানুষের পরামর্শ ভিন্ন ছিল কিন্তু কী হয়েছে? তিনি (রা.) যে দৃঢ় সংকল্পের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন তাঁর সেই দৃঢ় সংকল্পের কারণে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় ও সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। স্মরণ রেখো! মানুষ যখন খোদাকে ভয় করে তখন সৃষ্টি বা মানুষের প্রতাপ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। এটিই হলো মনসবে খিলাফত তথা খিলাফতের আসনের তাৎপর্য।

বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা। মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় যুগে গনিমত, খুমুস, ফ্যায়, যাকাত ইত্যাদির যে ধনসম্পদ আসতো তা তিনি তখনই সবার সামনে মসজিদে বসে বণ্টন করে দিতেন। তাই এভাবে বলা যায় যে, এই রূপে নবীর যুগেও **বায়তুল মাল** বিভাগ বিদ্যমান ছিল। অবশ্য হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে বিভিন্ন (স্থানে) বিজয়ের দরুন অন্যান্য খাত ছাড়াও গণিমত ও জিযিয়া বা করের অর্থও অনেক বেশি আসতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ এতে প্রবৃদ্ধি ঘটে। ফলে হযরত আবু বকর (রা.) একটি বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক মনে করেন যাতে বণ্টন ও খরচ হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখা যায়। অতএব, তিনি (রা.) জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের পরামর্শক্রমে এর জন্য একটি বাড়ি নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু এটি শুধু নামসর্বস্ব বায়তুল মাল ছিল। কেননা, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বদা এ চেষ্টাই করতেন যে, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য সামগ্রী আসার সাথে সাথেই যেন সেগুলো বণ্টন করে দেয়া হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র স্কন্ধে অর্পিত হয়। শুরুতে হযরত আবু বকর (রা.) সুনা' উপত্যকায় **বায়তুল মাল** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এর জন্য কোনো নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত ছিল না। সুনা' ছিল মসজিদে নববী থেকে প্রায় দুই মাইল দূরত্বে মদিনার শহরতলিতে অবস্থিত একটি জায়গা। একবার কেউ একজন বলে, আপনি বায়তুল মালের নিরাপত্তার জন্য কোনো প্রহরী নিযুক্ত করছেন না কেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, এর নিরাপত্তার জন্য একটি তালাই যথেষ্ট, অর্থাৎ তালা লাগানো থাকলেই চলবে। কেননা, বায়তুল মালে যা-ই জমা হতো তা তিনি বণ্টন করে দিতেন। অধিকাংশ সময় এটি খালিই পড়ে থাকত। এমনকি এটি একেবারেই খালি হয়ে যেত। তিনি (রা.) মদিনায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর বায়তুল মালকে তিনি (রা.) তাঁর বাড়িতেই স্থানান্তরিত করে নেন। তাঁর রীতি ছিল, বায়তুল মালে যে সম্পদ থাকত তিনি (রা.) তা মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিতেন, এমনকি তা খালি হয়ে যেত। বণ্টন করার ক্ষেত্রে তিনি (রা.) প্রত্যেককে সমানভাবে দিতেন। এছাড়া এই সম্পদ দিয়ে তিনি (রা.) উট, ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয় করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বণ্টন করে দিতেন। একবার তিনি (রা.) বেদুঈনদের কাছ

থেকে চাদর ক্রয় করে মদিনার বিধবাদের মাঝে বিতরণ করেন। অনেকবারই হয়ত করে থাকবেন, তবে রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ একবারই করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য বায়তুল মাল থেকে সম্মানী বা ভাতা নির্ধারণ করা। এ প্রসঙ্গে লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রয়োজনাদি পূরণের জন্যও বায়তুল মাল থেকেই সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর বলেন, আমার জাতি জানে, আমার এমন পেশা ছিল না যদ্বারা আমি নিজ পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে পারতাম না। অর্থাৎ, আমার উপার্জন এতো পরিমাণ ছিল– যার মাধ্যমে আমি সহজেই পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করছিলাম। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অতএব, আবু বকরের পরিবার-পরিজন এখন বায়তুল মাল থেকে খাবে আর তিনি অর্থাৎ, আবু বকর এই অর্থ দিয়ে মুসলমানদের জন্য ব্যবসাবাণিজ্য করবেন আর বাণিজ্যের মাধ্যমে এ সম্পদ বৃদ্ধি করবেন। অতএব, মুসলমানরা তাঁর জন্য বার্ষিক ৬ হাজার দিরহাম (সম্মানী) নির্ধারণ করে। কেউ কেউ বলে, তিনি ততটাই মঞ্জুর করেছিলেন যতটুকু তাঁর চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম ওয়ালী ছিলেন, অর্থাৎ সরকার প্রধান ছিলেন যাঁর প্রজারা তাঁর জন্য ভাতা বা সম্মানী নির্ধারণ করে। একটি রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর এক দিন সকালে বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাঁধে তাঁর ব্যবসার কাপড় ছিল। পথিমধ্যে তাঁর সাথে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.)'র সাক্ষাৎ হয়। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! কোথায় যাচ্ছেন? তিনি (রা.) বলেন, বাজারে যাচ্ছি। তারা বলেন, আপনি মুসলমানদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কী করছেন? তিনি বলেন, তাহলে আমি আমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ কীভাবে করব? তখন তাঁরা তাঁকে একথা বলে সাথে নিয়ে যান যে, আমরা আপনার জন্য অংশ নির্ধারণ করব। অতএব, বার্ষিক ৩ হাজার দিরহাম সম্মানী নির্ধারিত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী, ৬ হাজার দিরহাম (সম্মানী নির্ধারণ হয়), যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কারো কারো মতে, পুরো খিলাফতকালে তাঁকে ৬ হাজার দিরহাম দেয়া হয়েছিল। একইভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রায় সর্বসম্মতভাবে এটি পাওয়া যায় যে, যদিও হযরত আবু বকর (রা.) নিজের এবং পরিবার-পরিজনের চাহিদা পূরণের জন্য সম্মানী নিয়েছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি সাকুল্য অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব, একটি রেওয়ায়েত রয়েছে (যাতে বর্ণিত হয়েছে), তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি (রা.) ওসীয়্যত করেন, তাঁর জমি বিক্রয় করে এর মূল্য দিয়ে যেন সেই অর্থ পরিশোধ করা হয় যা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য বায়তুল মাল থেকে নিয়েছিলেন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে হযরত আয়েশা (রা.)-কে তিনি বলেন, খলীফা হওয়ার পর থেকে আমি মানুষের কোনো দিনার বা দিরহাম খাই নি। বরং সাধারণ খাবার খেয়েছি এবং মোটা কাপড় পড়েছি। এছাড়া মুসলমানদের গনিমতের মাল থেকে কেবল এই জিনিসগুলো রয়েছে যে, দাস, উট এবং চাদর। অতএব, আমার মৃত্যুর পর এসব জিনিস উমরের নিকট পাঠিয়ে দিও। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি (রা.) মৃত্যু বরণ করার পর সেসব জিনিস আমি হযরত উমর (রা.)'র নিকট পাঠিয়ে দেই। হযরত উমর (রা.) সেগুলো দেখে কাঁদতে আরম্ভ

করেন। এমনকি তাঁর অশ্রু গড়িয়ে মাটিতে পড়তে থাকে আর তখন হযরত উমর (রা.) (বার বার) শুধু একথাই বলছিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করুন; তিনি (রা.) তাঁর পরবর্তীদের বিপদে ফেলে গেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যু বরণ করার পর হযরত উমর (রা.) গুটিকতক সাহাবীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বায়তুল মালের (অবস্থা) পর্যবেক্ষণ করেন। তখন হযরত উমর (রা.) সেখানে কোনো জিনিস, অর্থাৎ দিনার বা দিরহাম পান নি। কিছুই ছিল না, একদম খালি ছিল। তিনি সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি (রা.) বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে বিচার বিভাগকে রীতিমতো প্রতিষ্ঠা করা না হলেও তিনি (রা.) তাঁর বিচার বিভাগের দায়িত্ব হযরত উমর (রা.)'র ওপর অর্পণ করে রেখেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আপনার পক্ষ থেকে আদালতের বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করব। হযরত উমর (রা.) এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন, কিন্তু এ সময়ের মধ্যে দু'জন মানুষও তাঁর কাছে ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে আসে নি। কোনো ঝগড়াবিবাদই হতো না। কোনো সমস্যাই সৃষ্টি হতো না। মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। কোনো মামলা এলেও হযরত আবু বকর (রা.) তা সমাধানের জন্য নিজেই সময় বের করে নিতেন। নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিতেন। কাযা বা বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন হযরত উমর (রা.) এবং তাকে সহায়তা করার জন্য নিম্নবর্ণিত সাহাবীরা নিযুক্ত ছিলেন:

হযরত আলী (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)।

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, তৎকালে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সততার মান এমন ছিল যে, মাসের পর মাস পেরিয়ে যেতো অথচ দু'জন লোকও (বিচার নিয়ে) মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসতো না।

ইফতা বা ফতোয়া বিভাগ সম্পর্কে লেখা আছে যে, নতুন নতুন গোত্র এবং জনগোষ্ঠী ইসলামে প্রবেশ করছিল এবং অবস্থার নিরিখে কতক নতুন নতুন ফিকাহ্ বিষয়ক সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছিল তাই হযরত আবু বকর (রা.) সাধারণ মুসলমানদের সুবিধার্থে এবং দিকনির্দেশনার জন্য ফতোয়া বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-কে ফতোয়া দেওয়ার জন্য নিয়োগ করেন। কেননা, এসব সাহাবী **"তাফাক্কাহু ফিদ্দীন"** (তথা ধর্ম বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী) এবং জ্ঞান ও (কোনো কিছু) ব্যাখ্যা করার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন। এক বর্ণনানুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)ও ফতোয়া প্রদানকারী ঐসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের ছাড়া অন্য কারো ফতোয়া প্রদানের অনুমতি ছিল না। একজন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করা বা লেখালেখির বিভাগ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে, আধুনিক যুগের পরিভাষায় 'কাতেব'-কে রাষ্ট্রের সচিব বা সেক্রেটারি বলা উচিত। অর্থাৎ সেই সচিব যিনি মিটিং-এর নোটস নেন এবং মিটিং-এর (সিদ্ধান্তসমূহ) পড়ে শোনান। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু সরকারি অধ্যাদেশ লেখা, চুক্তিনামা সম্পাদন বা লেখা এবং অন্যান্য লেখালেখির কাজের জন্য কিছু লোক নির্ধারিত ছিলেন। লেখালেখির কাজে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। অতএব, (হযরত আবু বকর) সিদ্দীক (রা.)'র যুগেও এই দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) এই লিপিবদ্ধ করা বা লেখালেখির বিভাগের

দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং অনেক সময় তার কাছে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবী যেমন, হযরত আলী (রা.) অথবা হযরত উসমান (রা.)ও এই দায়িত্ব সম্পাদন করতেন।

সামরিক বিভাগ। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে নিয়মতান্ত্রিক কোনো সেনা ব্যবস্থাপনা ছিল না। জিহাদের সময় প্রত্যেক মুসলমানই মুজাহিদ বা যোদ্ধা হতেন। গোত্র অনুযায়ী সেনা বণ্টন হতো। প্রত্যেক গোত্রের নেতা ভিন্ন ভিন্ন হতো আর এবং তাদের সবার ওপর থাকতো আমীর উল্ উমারা বা প্রধান সেনাপতির পদ, যেটি হযরত আবু বকর (রা.) প্রবর্তন করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলেন যে, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যে আমদানি হতো তার একটি নির্ধারিত অংশ সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য পৃথক করে রাখতেন যদ্বারা অস্ত্রশস্ত্র এবং মালামাল পরিবহনের জন্য পশু ক্রয় করা হতো। এছাড়া জিহাদের উট এবং ঘোড়া লালনপালনের জন্য কতক চারণভূমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

একজন জীবনীকার লিখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র সামরিক ব্যবস্থাপনা সেই বেদুঈন পদ্ধতির অধিক নিকটবর্তী ছিল যা মহানবী (সা.)-এর (নবুয়্যত) কালেরও পূর্বে আরব গোত্রগুলোর মাঝে প্রচলিত ছিল। সেসময় সরকারের কাছে কোনো সুশৃঙ্খল সেনাদল ছিল না বরং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা প্রদানের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করতো। যখন যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হতো তখন বিভিন্ন গোত্র অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তো এবং শত্রুদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতো। রসদপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য গোত্রগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতো না বরং নিজেরাই এসব জিনিসের ব্যবস্থা করতো। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের বেতন-ভাতাও দেয়া হতো না, বরং সেই গনিমতের মাল (তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেই) তারা নিজেদের সেবার বিনিময় মনে করতো। যুদ্ধক্ষেত্রে যে গনিমতের মাল লাভ হতো তার পাঁচভাগের চারভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হতো এবং পঞ্চমাংশ খলীফার সমীপে রাজধানীতে প্রেরণ করা হতো যা তিনি বায়তুল মালে জমা করে দিতেন। খুমুসের (এক-পঞ্চমাংশ) মাধ্যমে রাজ্যের নৈমিত্যিক ব্যয় নির্বাহ করা হতো। তিনি (রা.) যুদ্ধের সেনাপতিদের যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যুদ্ধে যাদেরকে আমীর উল্ উমারা নিযুক্ত করা হতো, তাদের সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যুদ্ধে গমনকারী সেনাপ্রধান ও কমাণ্ডারদেরও দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। হযরত উসামা (রা.)'র সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, **"আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি। তোমরা খিয়ানত (তথা বিশ্বাসঘাতকতা) করবে না এবং মালে গনিমত থেকে চুরি করবে না। তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, মুসলা (তথা নিহত ব্যক্তির চেহারা বিকৃত) করবে না, কোনো শিশু, বৃদ্ধ ও নারীকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না; তা জ্বালাবে না এবং ফলবান কোনো বৃক্ষ কাটবে না। খাবার উদ্দেশ্য বৈ কোনো ছাগল, গরু বা উট জবাই করবে না; প্রয়োজন হলে (জবাই) করবে, অন্যথায় নয়। তোমরা এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা নিজেদেরকে গির্জায় উৎসর্গ করে রেখেছে। কাজেই, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিও; যারা রাহেব বা সন্ন্যাসী– তাদেরকে কিছু বলবে না। তোমরা এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা তোমাদেরকে বাহারি খাবার বিভিন্ন পাত্রে পরিবেশন করবে। তোমরা সেগুলো আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (তথা বিসমিল্লাহ্ বলে) খাবে। এমন লোকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে যারা নিজেদের মাথার চুল মাঝ থেকে মুণ্ডন করে রেখেছে আর চতুর্দিক থেকে পট্টির (তথা জুলফির) ন্যায় চুল রেখে দিয়েছে। তরবারি দ্বারা তাদের শায়েস্তা করবে, কেননা এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানিদাতা এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাত্রা করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সব ধরনের আঘাত, প্রত্যেক ধরনের রোগ-বালাই এবং প্লেগ থেকে নিরাপদ রাখুন।"** অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-কে সিরিয়ার যুদ্ধে প্রেরণকালে বলেন। পূর্বেও আমি এটি বর্ণনা করেছি; বিগত খুতবায়। কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সারমর্ম পুনরায় বর্ণনা করছি। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্মরণ রাখার মতো। (বিশেষত) প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য মনে রাখার মতো বিষয়। তিনি (রা.) বলেন,

আমি তোমাকে গভর্নর নিযুক্ত করেছি যাতে আমি তোমাকে পরীক্ষা করি, তোমাকে যাচাই করি এবং তোমাকে বহির্বিশ্বে প্রেরণ করে তোমার তরবীয়ত করি। যদি তুমি তোমার দায়িত্বাবলি সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করো তাহলে তোমাকে পুনরায় তোমার দায়িত্বে নিযুক্ত করব এবং তোমাকে আরও পদোন্নতি দিব। আর তুমি অলসতা দেখালে তোমাকে পদচ্যুত করব। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বনকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। তিনি তোমার ভেতরটা সেভাবেই দেখতে পান যেভাবে বাইরেরটা দেখেন। মানুষের মাঝে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অধিক নিকটবর্তী যে আল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্বের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি পালন করে এবং মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি যে নিজ কর্ম দ্বারা সবচেয়ে বেশি তাঁর নৈকট্য অর্জন করে। এরপর বলেন, অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এসব বিষয় চরম অপছন্দনীয়। এরপর বলেন, তুমি তোমার সেনাদলের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে আর তাদেরকে যখন হিতোপদেশ দিবে তখন তা সংক্ষেপে দিও, কেননা দীর্ঘ আলোচনা অনেক বিষয় বিস্মৃত করে দেয়। তুমি নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখবে। তোমার জন্য অন্যরাও সংশোধিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, নেতা যদি নিজেকে সৎ রাখে, কর্মকর্তা যদি নিজেকে সৎ রাখে তাহলে আপনাআপনি মানুষের সংশোধন হয়ে যায়)। আর নামায যথাসময়ে পূর্ণ রুকু ও সেজদার মাধ্যমে আদায় করবে। (নিয়মিত নামায পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়)। এরপর বলেন, শত্রুপক্ষের কোনো দূত তোমার কাছে আসলে তাকে সম্মান করবে, তাকে খুব কম সময় অবস্থান করতে দিবে (অর্থাৎ তোমাদের কাছে তারা যেন অধিক সময় অবস্থান না করে) আর তোমাদের সেনাদলের কাছে থেকে যেন দ্রুত চলে যায়। সেনাদলের সাথে বেশিক্ষণ অবস্থান না করে দ্রুত যেন চলে যায় যাতে করে তারা সেনাবাহিনী সম্পর্কে খুব একটা জানতে না পারে। তাদেরকে নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত করবে না। খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবে। তিনি (রা.) বলেন, নিজেদের লোকদেরকে তার সাথে আলাপ করতে বারণ করবে। সবাইকে এসব দূতের সাথে সাক্ষাৎ করতে দিবে না। তারা যেখানে চাইবে ঘুরে বেড়াবে আর সবার সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকবে তা যেন না হয়। তারা কেবল নির্ধারিত লোকদের সাথেই সাক্ষাৎ করবে বা কথা বলবে। সর্বসাধারণের মাঝে যেন ঢুকে না যায়। তুমি যখন নিজে তাদের সাথে কথা বলবে তখন নিজেদের গোপনীয়তা তাদের সামনে প্রকাশ করবে না। অর্থাৎ নিজেও দূতদের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কথা বলবে। এরপর {তিনি (রা.)} পরামর্শ করার বিষয়ে বলেন, কারো কাছ থেকে তুমি পরামর্শ নিতে চাইলে সত্য বলবে তাহলে সঠিক পরামর্শ পাবে। পুরো বিষয় স্পষ্ট করে বলে পরামর্শ নিবে। পরামর্শদাতার কাছে (সংশ্লিষ্ট) কোন তথ্য গোপন করবে না, নইলে তোমার (এহেন কাজের) জন্য তুমিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একজন কর্মকর্তা বা নেতা বা কমান্ডার কীভাবে পুরো দিনের তথ্য বা খবরাখবর সংগ্রহ করবে এ সম্পর্কে {আবু বকর (রা.)} বলেন, নিজের বন্ধুদের সাথে রাতের বেলা কথা বলো। সন্ধ্যায় (তাদের সাথে) বসো, তাদের মধ্য থেকে (উপযুক্ত) লোক নির্বাচন করে তাদের সাথে কথা বলো, তাহলে তুমি তথ্য বা খবরাখবর পেয়ে যাবে। অধিকাংশ সময় অবগত না করেই অকস্মাৎ তাদের চৌকি পরিদর্শন করবে, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করা-ও আবশ্যক। যাকে নিজের দায়িত্বে উদাসীন পাবে তাকে ভালোভাবে উপদেশ দিবে। এরপর তিনি বলেন, শাস্তি প্রদানে ব্যতিব্যস্ত হবে না আর একেবারে উপেক্ষাও করবে না। দু'টোই আবশ্যক অর্থাৎ, শাস্তি প্রদানে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যতিব্যস্তও হওয়া যাবে না আর একেবারে উদাসীনও হওয়া যাবে না। অর্থাৎ কিছুই বলবে না তা যেন না হয়। নিজ সেনাবাহিনী সম্পর্কে উদাসীন হবে না। তাদের সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরী করে তাদেরকে অপদস্থ

করবে না। সবসময় নিজের লোকদের (পেছনে) গোয়েন্দাগিরী করতে থাকবে না, কেননা এতে তাদের অপমান হয়। তাদের গোপন কথা লোকদের কাছে বর্ণনা করবে না। তুমি কারো গোপন তথ্য জানতে পারলে তা অন্য কাউকে বলবে না। অথর্ব লোকদের সাথে বসবে না, সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত লোকদের সাথে উঠা-বসা করবে। কাপুরুষ হবে না, তাহলে অন্যরাও কাপুরুষ হয়ে যাবে। গনিমতের মাল খিয়ানত করবে না, কেননা এটি অভাবের নিকটবর্তী করে এবং বিজয় ও ঐশী সাহায্যকে বাধাগ্রস্ত করে।

এখানে আমি অনেকগুলো বিষয় বর্ণনা করেছি এর মধ্যে কিছু নতুন বিষয় যেমনটি আমি বলেছি, এগুলো সেনাকর্মকর্তাদের ছাড়া আমাদের (জামা'তের) পদাধিকারীদের জন্যও আবশ্যক। এগুলো তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত তখনই কাজে বরকত সৃষ্টি হবে। এই সারাংশ আমি পুনরায় এজন্য বর্ণনা করছি যাতে (এগুলো) কর্মকর্তাদের স্মরণে থাকে।

ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করার বিষয়ে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। এসব প্রদেশে তিনি (রা.) আমীর ও গভর্নর নিযুক্ত করেন। মদিনা ছিল তাদের রাজধানী, যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হিসাবে সমাসীন ছিলেন। কর্মকর্তা নিয়োগ করার পন্থা সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র কার্যরীতি এই ছিল যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে কোনো জাতির ওপর গভর্নর নিযুক্ত করার সময় খেয়াল রাখতেন যে, উক্ত জাতির লোকদের মাঝে কোনো নেক ও পুণ্যবান সদস্য আছে কিনা, তাহলে তাদের মধ্য থেকেই গভর্নর নিযুক্ত করতেন। তায়েফ এবং অন্যান্য গোত্রের ওপর তাদেরই মধ্য থেকেই গভর্নর নিযুক্ত করেন আর তিনি যখন কাউকে গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করতেন তখন উক্ত অঞ্চলে তার গভর্নর হওয়ার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে দিতেন। আর অধিকাংশ সময় সে অঞ্চলে পৌঁছার রাস্তাও তার জন্য নির্ধারণ করে দিতেন। আর তাতে সেসব স্থানেরও উল্লেখ করতেন যেখান দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হতো। বিশেষভাবে এই নিযুক্তি যদি ঐসব অঞ্চলে হতো যা এখনও বিজিত হয় নি এবং ইসলামী খিলাফতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতো। সিরিয়া ও ইরাক বিজয়াভিযান এবং রাষ্ট্রদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর কখনো কখনো তিনি কোনো কোনো অঞ্চলকে অপর অঞ্চলের সাথে যুক্ত করে দিতেন; বিশেষভাবে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের পর এমনটি করা হয়। অতএব, হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ, যিনি হাযারা মওতের গভর্নর ছিলেন, কিন্দাকেও তার তত্ত্বাবধানে যুক্ত করে দেয়া হয় আর এরপর তিনি হাযারা মওত ও কিন্দা উভয়ের গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে কর্মকর্তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতাকে দৃষ্টিপটে রাখা হতো। এছাড়া এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হতো যিনি সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। [যারা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য পেয়েছেন, তাদেরকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হতো; এই বিষয়টিকে অগ্রগণ্য করা হতো বা অগ্রাধিকার দেয়া হতো।] এই বিষয়ে তাঁর মানদণ্ড ছিল এরূপ– যে ব্যক্তিকে মহানবী (সা.) যে কাজের জন্য নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন, তিনি (রা.) সে বিষয়ে আদৌ কোনো পরিবর্তন করতেন না। যেমন, মহানবী (সা.) হযরত উসামাকে সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে কিছু লোক যৌক্তিক কারণে এই পদে কোনো প্রবীণ সাহাবীকে নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি (রা.) হযরত উসামাকেই এই পদে বহাল রাখেন। একইভাবে তিনি (রা.) এ-ও দেখতেন যে, মহানবী (সা.)-এর

সাহচর্যে কে বেশি কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। একারণেই তিনি অধিকাংশ এবং বেশিরভাগ দায়িত্ব সেসব ব্যক্তির স্কন্ধে অর্পণ করতেন যারা মক্কা-বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি কখনো গোত্রগত পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতির রীতি অবলম্বন করেন নি। এরূপ কঠোর নীতি ও উন্নত মানদণ্ডের কারণেই তাঁর নিযুক্ত কর্মকর্তা ও শাসকগণ সর্বদা নিজেদের সর্বোত্তম নৈপুন্য ইসলাম এবং মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্মকর্তা নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর মতামতকেও সম্মান দেখাতেন। যেমন, হযরত আলা বিন হাযরামী মহানবী (সা.)-এর যুগে বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। পরবর্তীতে কোনো কারণে তাকে সেখান থেকে অন্যত্র প্রেরণ করা হয়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে বাহরাইনবাসীরা হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে নিবেদন করে যে, হযরত আলাকে যেন তাদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। তাই হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলা বিন হাযরামীকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

কর্মকর্তাদেরও তিনি বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন; এ সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.) শাসকদের নিযুক্ত করার সময় স্বয়ং তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিতেন। তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আমর বিন আস ও ওয়ালীদ বিন উকবাকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে খোদাকে ভয় করতে থাকো; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ সুগম করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিয্‌ক প্রদান করেন, যেখান থেকে পাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে, তিনি তার পাপ ক্ষমা করে দেন [অর্থাৎ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে দেন] এবং তাকে তার প্রতিদান বাড়িয়ে দেন। সেসব বিষয়ে খোদা তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করা উত্তম যেসব বিষয়ে খোদা তা'লার বান্দারা পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করে। তোমরা খোদা তা'লার পথসমূহের মধ্যে একটি পথে যাত্রা করছ, তাই যে বিষয় তোমাদের ধর্মের শক্তি এবং তোমাদের রাষ্ট্রের সুরক্ষার কারণ হবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের আলস্য প্রদর্শন অমার্জনীয় অপরাধ। তাই তোমাদের পক্ষ থেকে কখনো অলসতা বা ঔদাসীন্য দেখানো উচিত নয়। হযরত মুসতাওরেদ বিন শাদ্দাদ বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাদের (পক্ষ থেকে) কর্মকর্তা নিযুক্ত হবে, সে যেন একজন স্ত্রী রাখে এবং যদি তার কাছে কোনো খাদেম বা সেবক না থাকে তবে একজন সেবক রাখে, আর যদি তার কাছে থাকার মতো বাসস্থান না থাকে তবে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি রাখে। মুসতাওরেদ বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলো ছাড়া একটি জিনিসও নেয়, সে খিয়ানতকারী বা বিশ্বাসঘাতক, অথবা তিনি (রা.) বলেন, সে চোর। কর্মকর্তাদের কীভাবে জবাবদিহিতা করতে হতো, হযরত আবু বকর (রা.) কর্মকর্তা ও শাসকদের প্রতিটি গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। যেহেতু তারা মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় সাহচর্য লাভ করেছিলেন, এজন্য হযরত উমর (রা.)'র (রীতির) বিপরীতে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন। [তারা কী করছে তার ওপর তিনি (রা.) দৃষ্টি রাখতেন, কিন্তু ছোটখাটো বিষয়গুলো উপেক্ষা করতেন।] তাবারীর ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কর্মকর্তা ও লোকদেরকে বন্দি করতেন না; তবে কেউ যদি বড় কোনো ভুল করতো তাহলে তিনি তাকে উপযুক্ত শাসন অবশ্যই করতেন, তা সে পদের দিক থেকে যত বড়ই হোক না কেন। হযরত মুহাজের বিন উমাইয়্যার ব্যাপারে তিনি জানতে পারেন যে, তিনি এমন এক নারীর দাঁত উপড়ে ফেলেন যে মুসলমানদের বিদ্রূপ

করতো, এতে তিনি দ্রুত মুহাজের (রা.)-কে ভর্ৎসনা করে পত্র লিখেন। এমনকি হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদেরও কোনো অবহেলা সম্পর্কে অবগত হলে তিনি তাকেও ভর্ৎসনা করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

আমীর ও গভর্নরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) বিভিন্ন অঞ্চল, শহর ও জনপদে যেসব গভর্নর ও আমীর নিযুক্ত করেছিলেন তাদের স্কন্ধে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কাজ অর্পণ করা হয়েছিল। আমীর এবং তাদের নায়েবদের আর্থিক বিষয়াদির দায়িত্বও ছিল। তারা নিজ নিজ অঞ্চলে সম্পদশালীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করতেন আর অমুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া বা কর আদায় করে বায়তুল মালে জমা করতেন। মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই তারা এই দায়িত্ব পালন করছিলেন। মহানবী (সা.)-এর যুগে সম্পাদিত সকল চুক্তির নবায়ন করা হয়। নাজরানের গভর্নর, মহানবী (সা.) এবং নাজরানবাসীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি নবায়ন করেছিল; কেননা নাজরানবাসী খ্রিষ্টানরা এর দাবি করেছিল। আমীরগণ নিজ নিজ অঞ্চলের লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, ইসলামের তবলীগ ও দাওয়াত এবং প্রচার ও প্রসারের কাজে ষোলো আনা ভূমিকা রাখতেন। তাদের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে গোলবৈঠক করে মানুষকে কুরআন, ইসলামী বিধিনিষেধ এবং শিষ্টাচার শেখাতেন আর তারা এগুলো মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে করতেন। এই দায়িত্ব মহানবী (সা.) এবং তাঁর খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)'র দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হতো। এ কারণে হযরত আবু বকর (রা.)'র আমীর ও গভর্নরগণ এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং খুব ভালোভাবে সম্পাদন করেছেন। এমনকি একজন ঐতিহাসিক হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক হাযারা মওতে নিযুক্ত আমীর যিয়াদ বিন লাবীদ সম্পর্কে লিখেছেন, সকাল হলে যিয়াদ লোকদেরকে কুরআন পড়ানোর জন্য আসতেন যেমনটি তিনি আমীর হওয়ার পূর্বে কুরআন পড়াতে আসতেন। একইভাবে তালীম ও তরবীয়তের মাধ্যমে এসব আমীর নিজ নিজ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিজিত অঞ্চল, মুরতাদ ও বিদ্রোহী প্রবণ অঞ্চলগুলোতে এই তালীম ও তরবিয়তী কার্যক্রমের ফলেই ইসলাম সুদৃঢ় হয়। এমন অঞ্চল, যেখানকার বাসিন্দারা নবাগত মুসলমান ছিল আর ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে অনবহিত ছিল; সেসব অঞ্চলে এই শিক্ষা খুবই ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়। এছাড়া ইসলামের শক্তিশালী কেন্দ্রগুলো যেমন মক্কা মুকার্‌রমা, তায়েফ ও মদিনা মুনাওয়ারাতেও এমনসব মুয়াল্লেম নিয়োজিত ছিলেন, যারা মানুষের তালীম ও তরবীয়তের ব্যবস্থা করতেন। এসব কিছুই খলীফা অথবা আমীরের নির্দেশে হতো, অথবা খলীফা বিশেষভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য যাদেরকে তালীমের কাজে নিযুক্ত করতেন তিনি এ দায়িত্ব পালন করতেন। আঞ্চলিক আমীর বা গভর্নর স্বয়ং নিজ প্রদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হতেন। তাকে কোনো সফরে যেতে হলে তার নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যেতে হতো যিনি তার ফিরে আসা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। এর দৃষ্টান্ত এরূপ, হযরত মুহাজের বিন আবি উমাইয়্যাকে মহানবী (সা.) কিন্দার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাঁর (সা.) মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.)ও তাকে একই পদে বহাল রাখেন। মুহাজের (রা.) তার অসুস্থতার কারণে ইয়েমেন যেতে পারেন নি, তাই তিনি মদিনায় অবস্থান করেন আর নিজের স্থলে যিয়াদ বিন লাবীদকে প্রেরণ করেন যেন তার নিরাময় এবং ইয়েমেনে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত তিনি তার দায়িত্বাবলী পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা.)ও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন।

অনুরূপভাবে ইরাকে গভর্নর থাকাকালীন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ হীরায় তার প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত নিজের নায়েব নিযুক্ত করতেন।

এই স্মৃতিচারণ চলছে, ইনশাল্লাহ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)